যাক, বেণু আবার 'স্যার' বলছে। ফের সমীহের দূরত্বে ফিরে যাচ্ছে, মনে হয়।

সদানন্দ বলল, আমি সব বুঝতে পেরেছি। এই ব্যাপারটা যেন পাঁচজনের কানে না যায়। খবরদার! তোমার মেয়ের একটা ভবিষ্যৎ আছে।

– বাবা অনেককে বলে ফেলেছে, জানেন? ফুলি ফুঁপিয়ে ওঠে।

সদানন্দ সামলাবার চেষ্টা করে, ঠিক আছে। সকলকে ফের বলে দেবে, এটা অসম্ভব। এমন কিছু ঘটবার কোনও কারণ নেই। সম্ভাবনাও নেই। ভাটু কেমন ছেলে আমি খোঁজ নেব। লেখাপড়া কদ্দূর করেছে?

জবাব দেয় ফুলি, পড়াশোনায় ভালো ছিল স্যার। রঘুনাথগঞ্জের স্কুল থেকে এইচ.এস পাস করেছিল ফার্স্ট ডিভিশনে। তারপর কলেজে ইউনিয়ন করতে গিয়ে লেখাপড়া লাটে তুলে দিল। পরীক্ষায় ড্রপ-আউট। এ'বছর আমার চাপে আবার ফর্ম ফিল-আপ করেছে। পার্ট ওয়ান ক্লিয়ার ছিল, পার্ট টু-তে বসবে। এরপর তো আর একটা ইয়ার।

সদানন্দ সান্ত্বনা দেয়, আমি দেখব। তোমরা এই সময় মেয়েটাকে ডিসটার্ব কোরো না। সামনের বছর পরীক্ষাটা দিতে দাও।

মেয়েটি কাতর গলায় বলে, আমাকে আর পড়াবেন না স্যার?

– না। প্রশ্ন ওঠে না। কে বা কারা এমন রটিয়েছে, জানি না। তবে যখন কথাটা উঠেছে, তুমি আর এই ঘরে আসবে না। আমি অন্য টিচারকে বলে দেখব। তুমি লেখাপড়াটা মন দিয়ে করো আগে।

টাকাপয়সার অত দরকার কিছু নেই। পেটের দায়ে গোলামি করতে আসেনি। ফের আর একটা চাকরি জুটিয়ে নেওয়ার যোগ্যতাও তার আছে। পালাতে ও পারেই। কিন্তু পালাবে কেন?

তবে নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি চেয়ে সদানন্দ বুঝতে পেরেছে, ভুল একটা সে করেছিল। গ্রাম্য পরিস্থিতি বিচার করতে না পারার ভুল। একটা মেয়েকে আলাদা করে পড়ানোর দায়িত্ব তার নেওয়া ঠিক হয়নি। এমন ভ্রান্তি আর কখনও হবে না। অভিজ্ঞতা একটা হল। একেবারে ঠেকে শেখা যাকে বলে।

সদানন্দ পালাল না। তবে গ্রামের একজন সম্মাননীয় মানুষ হিসাবে আরও সাবধান এবং সচেতন হয়ে গেল। এভাবে আর কোথাও ফেঁসে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি যেন না হয়!

...

নিজেকে অনেকটা বদলে ফেলেছে সদানন্দ। নিজের আচার আচরণে, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায়। যেখানে-সেখানে বসে গিয়ে আড্ডায় রাশ টেনেছে। নিজের কাজকর্ম নিয়েই থাকে এবং আমোদপ্রমোদহীন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করতে করতে ক্রমশ একাকিত্বে আক্রান্ত হয়। সামাজিক মেলামেশার গণ্ডি গুটিয়ে এনে সে এখন দ্বীপের মধ্যে এক দ্বীপ।

ঘটনাটা নিয়ে কপালগুণে গ্রামের মধ্যে জল ঘোলা হয়নি বিশেষ। কে কে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে, সদানন্দ আঁচ করতে পারে

নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি চেয়ে সদানন্দ বুঝতে পেরেছে, ভুল একটা সে করেছিল। গ্রাম্য পরিস্থিতি বিচার করতে না পারার ভুল। একটা মেয়েকে আলাদা করে পড়ানোর দায়িত্ব তার নেওয়া ঠিক হয়নি। এমন ভ্রান্তি আর কখনও হবে না

ফুলির মুখে স্বস্তি আর ওর বাবা-মায়ের চেহারায় হতাশা ফুটে উঠল। সদানন্দ বেণুকে বলল, তোমরা আর দাঁড়িয়ে আছ কেন? এমন সব কাণ্ড করে মেয়েটার মাথা আর খেও না। আমাকে যতটা বিব্রত করলে, এরপর মানুষের সঙ্গে খোলামেলা মেশার আগে দশবার ভাবতে হবে।

তিনজনে চলে গেল। রবিবারের ছুটির মেজাজটাই দিয়ে গেল মাটি করে। এবার থেকে সবার সঙ্গে মেলামেশার ধরনটাকে বদলাতে হবে। মেয়েটা জোর বাঁচান বাঁচিয়েছে তাকে এ যাত্রা। ফুলি চাপে পড়ে কিংবা মগজ ধোলাই হয়ে অন্য সুরে যদি কথা বলত, কেচ্ছা হত চূড়ান্ত। মেয়েটার সাহস আছে। সত্যি কথা বলতে গলা কেঁপে যায়নি। চাপ ছিল প্রচণ্ড, বোঝাই যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যথেষ্ট প্ররোচনা ও প্রলোভন সত্ত্বেও মিথ্যে বলতে পারল না। সদানন্দ বুঝল, মেয়েটা শুধু মেধাবী নয়, সাহসীও।

এরপর কী করা যায়! গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে? ছুটি নিয়ে বসে থাকবে বাতাসপুরে? চাকরি তো চট করে বদলে নেওয়া যায় না। এটা একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ। বদলি বা পদত্যাগের একটা পদ্ধতি আছে।

বড় আশা নিয়ে এই দ্বীপচরে এসেছিল সদানন্দ। স্কুলের উন্নতি করবে। মানুষের ভালোমন্দের সঙ্গে থাকবে। গত বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সকলের সঙ্গে নিজেও ভোট বয়কটের মতো একটা অনৈতিক ব্যাপারে সামিল হল। স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইল। সকলের সঙ্গে বেশ মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই বিশ্রী ব্যাপারটাতে মন ভেঙে গেল একেবারে।

সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলেই বা কী হয়!

না। বেণু মণ্ডলও সদানন্দর সম্মতি আদায় করতে পারেনি বলে আর জোরাজুরি করেনি। হয়তো নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরেছে।

তবে সদানন্দ একটু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে। বেণুর দোকানে যে একেবারে পা রাখে, না, এমন নয়। আসা যাওয়ার পথে কখনও পাউরুটি বা বিস্কুটটিস্কুট কিনল। দু'চারটে কথাবার্তাও বলল ভদ্রতামাফিক। তবে নিয়মিত সেই বিকেলে গিয়ে জলখাবার খাওয়ার ব্যাপারটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকালের মতো বিকেলেও কিছু চটজলদি ঘরোয়া খাবারদাবারের বন্দোবস্ত করে রাখছে। মুড়ি চিড়ে ছাতু – এইসব আর কি! অসুবিধে হয়, মানিয়েও নেয়। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যখন নয় তার, তখন এটুকু সমঝোতা তাকে করতেই হবে। মানিয়ে নেওয়াটাও তো জীবনে জরুরি।

মেধাবী ছাত্র, ভালো রেজাল্ট। সাকসেসফুল কেরিয়ার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। বিলেতি ডিপ্লোমাও আছে একখানা। মনের মতো চাকরিও পেয়েছিল। তবু কোথাও যেন একটা বড় ফাঁক থেকে গিয়েছে। এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে সেটা সদানন্দ হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে কি? রিটায়ারমেন্টের পর শরীর অথর্ব হলে তাকে কে দেখবে? কোথায় থাকবে তখন অনুগত ছাত্রছাত্রীর দল, কোথায় থাকবেন সহমর্মী সহকর্মীরা? গ্রামের মানুষ তখন তাকে নিয়ে আর একটা গল্প ফেঁদে বসবে। হয়তো আরও অদ্ভুত, আরও অযৌক্তিক এবং অসম্ভব।

(ক্রমশ)

অঙ্কন ঃ সোমনাথ

রসেবশে

পাগল

দীপ মুখোপাধ্যায়

আমাদের পাড়ায় বহু বাড়িতেই একজন না একজন পাগল রয়েছে। সবাই যে ভয়ংকর প্রকৃতির তা কিন্তু নয়। কারওর মুদ্রাদোষজনিত আচরণ তো কারওর রয়েছে ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট ঘাটতি। সেই খুঁতের জন্যেই আমরা ওদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলি, পাগলে কী না বলে। ওদের আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে ততটা মাথাও ঘামাই না। যেন ভাঙা হাঁড়ি-পাতিল। মাঝেমধ্যে ঝেড়েপুছে নিলেই কাজ চলে যাবে। ওরা তবুও ক্ষতিকারক নয়।

তবে বদ্ধ পাগল কিংবা মারকুটে পাগলও রয়েছে। পাগলদের নিয়ে ছেলেবেলা থেকে আমার কৌতূহল কম ছিল না। সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু কী ধরনের পাগলের পর্যায়ে পড়ে? কিংবা পাগলামি একটি বিশেষ রোগ না বিকার? সেইসব প্রশ্ন গিজগিজ করত মাথায়। পাগল দেখলে বাচ্চারা ওদের তাক করে ঢিল ছুঁড়ত। দেখতাম বয়স্করা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। কমেডির আড়ালে এ যেন এক জীবনের নির্মম ট্রাজেডি। আসলে একটা মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের আর পাঁচজনের মতো ব্যবহার না করলেই তার পাগল নামকরণ অনিবার্য। এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে আমাদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এবং উত্তেজিত হাবভাব দেখলে আমরা সতর্ক হই। মাত্রা ছাড়ানো দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া বা অতিরিক্ত শুচিবায়িতার মতো নিউরোসিস রোগে আমি বা আপনি সহজেই আক্রান্ত হতে পারি। আমরা কী তবে পাগল?

অবশ্য সিজোফ্রেনিয়া বা ডিলিউশন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হলে সেই সাইকোটিক রোগীর জন্য কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে পাগল তকমা দিয়ে একঘরে করে রাখাটা কাজের কথা নয়। প্রেমে পড়লে দেখেছি গাল লাল হয়ে যায়। বেড়ে যায় হৃৎস্পন্দনের গতি। ঘামতে থাকে হাতের তালু। কোনও মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রেও একই লক্ষণ দেখা যায়। তা হলে প্রেমিককেও বুঝি পাগল বলতে হবে? লোকে বলত, পণ্ডিতিয়ার কার্তিকদা প্রেমে পড়ে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। দাড়ি কামাতেন না। ঘর থেকে বেরোতেন না। মদ্যপান শুরু করেছিলেন। গরচার পরিদির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর সব পাগলামি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই রাতারাতি উধাও। তবু পাগলের থেকে সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। কারণ পাগলরা অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনাকে নিজের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। আর পাগলের তো সাতখুন মাফ। এক পাগলকে থানার দারোগা সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে বাচ্চা ছেলেটাকে বাঁচালেন তাতে আপনাকে আর পাগল বলা চলবে না। তবে একটা দুঃসংবাদ রয়েছে। সেই ছেলেটা আমড়াগাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

পাগল লোকটা মিচকি হেসে বলল, ও মোটেই গলায় দড়ি দেয়নি। পুকুর থেকে তোলার পর ভিজে আছে বলে আমি নিজেই ওকে গাছের উপর শুকোতে দিয়েছিলাম। এমন করুণ পরিণতি হবে মোটেও আন্দাজ করিনি।

সেই পাগলের থানার বদলে স্থান হয় পাগলা গারদে। কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি তো দেখছি ভালো হয়ে গিয়েছ। ভাবছি তোমাকে ছেড়ে দেব। বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করবে তুমি?

সে বলেছিল, একটা গুলতি কিনে থানার সব কাচ ভাঙব আর দারোগা সাহেবকে গলা টিপে শেষ করে দেব। সেই পাগলের কী পরিণতি হয়েছিল সেটা আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। তবে এক পাগলের কথায় আমি সত্যিই ভড়কে গিয়েছিলাম। তাকে ঘরের কড়ি বরগায় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি নীচে নামালাম। বললাম, এমন করে ঝুলছিলিস কেন রে? মরবার শখ হয়েছিল বুঝি?

– কী যে বলেন স্যার! অকারণে ঝুলব কেন? আমি তো একশো ওয়াটের বাল্‌ব হয়ে গিয়েছিলাম।

রসিকতা করলাম, বাল্‌ব হলে তো তোর জ্বলে ওঠার কথা। তোকে তো মনে হচ্ছিল অন্ধকারে খাবি খাচ্ছিস।

পাগল বলল, আপনার মতো পাগল দুনিয়ায় নেই। দেখছেন না এখন লোডশেডিং চলছে। কারেন্টই নেই।

তাই আমার স্ত্রী যখন বলে, আমি মরে গেলে তুমি কী করবে ভেবে কুলকিনারা পাই না।

বলি, আমি সত্যিই দুঃখে পাগল হয়ে যাব। দুঃখ ভুলতে আকণ্ঠ মদ্যপান করব আর ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াব।

স্ত্রী বলে, কেন? আবার বিয়ে করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাই না সোনা?

আমি বলি, করতেও পারি। পাগল হলে মানুষ তো অনেককিছুই করে। আবার বিয়ে করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পাগলদের ভিন্ন চোখে দেখতেন। তিনি বিচিত্র প্রবন্ধে লিখছেন, পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি। আমাদের খ্যাপা দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খ্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কিনা যুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে – কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা খ্যাপামি বইকি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম – তাহা উলটপালট করিতেই আসে – তাহা আজিকার এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায় – কেহ তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে – কেহ নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে। এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।

আমরা তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা থেকে ভবাপাগলকে এখনও শ্রদ্ধা করি। গেয়ে উঠি, আমায় দে মা পাগল করে। অবজ্ঞা করি না খ্যাপা বাউলদের। গৌরখ্যাপা বা ননীখেপির কণ্ঠ আমাদের নিয়মের বাইরে নিয়ে যায়। খামখেয়ালি বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, ডাক্তার কিংবা উকিলবাবুদের আমরা পাগল বলে অশ্রদ্ধা করি না। গেয়ে উঠি রবিঠাকুরের গান, পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে/জানিয়ে দে'। পড়ি জয় গোস্বামীর 'পাগলি, তোমার সঙ্গে'। দেখি পাগলু চলচ্চিত্র কিংবা দেব-কোয়েলের লে পাগলু ডান্স। শীর্ষেন্দু লিখেছেন না, ভালোমানুষরা যদি পাগল না হয় তবে পাগলরা যে পাগল তা বুঝবে কী করে? তা ছাড়া পাগলরা যে সত্যিই পাগল তা পাগলরাও সঠিক জানেন। না হলে কী আর বটাইদা পাগলা গারদ থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি থেকে সুপারকে ফোন করবে, স্যার কাইন্ডলি ১৫ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখবেন ওখানে কেউ আছে কিনা? বড় চিন্তায় আছি।

সুপার লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে জানালেন, না তো। ঘরটাতো ফাঁকাই রয়েছে। আপনি কে বলছেন?

বটাইদার উত্তর, আঃ, মনে বড় শান্তি পেলাম। নিশ্চিত হলাম সত্যিই আমি পাগলা গারদ থেকে পালাতে পেরেছি।

এই বটাইদা পাগলা গারদে প্রথমদিকে নিজেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলতেন। ধীরে ধীরে চিকিৎসার গুণে ক্রমে আমজনতায় রূপান্তরিত হন। তারপর তিনি স্বাভাবিক। আসলে পাগল মানে পা দু'টো গোল নয়। সবার মতোই। আমিও তাই পাগলদের সমীহ করে চলি। পাগল আর পাগলা কুকুর তো এক নয়।

অঙ্কন ঃ অভি